Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIV, Issue-III, April 2026, Page No. 35-49
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.14.issue.03W.080

দীপাংশু দাশের 'উদ্বাস্তু' গল্পগ্রন্থে ভারতীয় সমাজ সমস্যা ও বাস্তবতা বিষয়ক আলোচনা

পঙ্কজ কান্তি মালাকার, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, অসম, ভারত*

Received: 28.02.2026; Accepted: 29.04.2026; Available online: 30.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In 2021, Dipangshu Das's short story collection *Udbastu* was published by Nabadiganta Prakashani, Silchar. Although the backdrop of his stories is the Barak Valley, they represent Indian society as a whole. All the stories in the collection deal with various socio-economic realities of Indian social life. Even in the twenty-first century, he has written stories centered on issues such as superstition, blind beliefs, evil practice, regressive customs etc that continue to persist in Indian society. Some stories explore the familial and social realities of women's lives. The collection also includes several stories about the rootless lives of those affected by the Partition of India, portraying the socio-economic struggles, emotions and contribution in nation building of the both displaced during Partition and the contemporary displaced. In addition, some stories highlight significant contemporary social issues and realities such as brain drain, cultural degradation, family disintegration, domestic violence and the question of equal rights. The objective of this essay is to prepare a report on the realities of Indian society as depicted in his stories.

Keywords: Evil practice, Witch Hunt, Dowry, Domestic violence, Brain-Drain, India partition, Citizenship

২০২১ খ্রিস্টাব্দে নবদিগন্ত প্রকাশনী, শিলচর থেকে দীপাংশু দাসের 'উদ্বাস্তু' ছোটগল্প সংকলনটি প্রকাশিত হয়। এই গল্পগ্রন্থের সবগুলো গল্পই ভারতীয় সমাজ জীবনের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা বিষয়ক। ভারতীয় সমাজে বর্তমান যুগ অবধি ফল্গুধারায় কিংবা অম্লানভাবে থেকে যাওয়া কিছু অন্ধবিশ্বাস–কু-সংস্কার ও কু-প্রথা জনিত সমস্যা, কেমনতর ভাবে মানবিক জীবনকে দলিত করছে। নারী নির্যাতন ও নারী জীবন কেন্দ্রিক সমাজের বাস্তবতা বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন। ভারতীয় উপমহাদেশে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগের বলি উদ্বাস্তুদের সামাজিক-নাগরিক জীবন যাপন বিষয়ক গল্প রচনা করেছেন। দেশভাগ জনিত সাম্প্রদায়িক উগ্রতা কিভাবে পূর্ব-পাকিস্তান বা বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের জীবন বিপদাপন্ন করে তুলেছে ও উদ্বাস্তু হতে বাধ্য করা হচ্ছে, তাদের আবেগ ও আর্তি উঠে এসেছে তার গল্পগুলোতে। এছাড়াও আধুনিক যুগের কিছু উল্লেখযোগ্য সমস্যা যেমন ব্রেইন-ড্রেইন, অপসংস্কৃতি, নারীপুরুষ বৈষম্য, পরিবার পৃথকীকরণ ইত্যাদি বিষয়ক গল্প লিখেছেন। এই গল্পগ্রন্থে মোট ২১টি গল্প রয়েছে। প্রতিটি গল্পই একেকটি সমস্যাকে প্রতিফলিত করছে, গল্পের পটভূমিকা রচনায় তিনি কোন একটি ভারতীয় সমাজের সমস্যাকে গ্রহণ করেছেন। এই গল্পগ্রন্থে ভারতীয় সমাজের বাস্তবতার খণ্ডচিত্রের একটি কোলাজ তৈরি করেছে। তথা আমাদের দেশের সভ্যতা একুশ শতকে পৌঁছে তার সামাজিক-মানবিক উন্নয়ন ও অবনয়নের তুলনা করছেন গল্পগুলোতে।

মূলত তাঁর গল্পগুলোর স্থানীয় প্রেক্ষাপট বরাক উপত্যকা। তাঁর গল্পগুলো পাঠে স্বাধীনতা ও দেশভাগ সমকালীন সময় থেকে পরবর্তী ৭০ বছরের বরাকের আর্থ-সামাজিক চালচিত্র খণ্ডচিত্রের কোলাজ তৈরি করে। আসাম রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্তের কাছাড়, শ্রীভূমি (করিমগঞ্জ) ও হাইলাকান্দি জেলা-ত্রয়ীকে একত্রে বরাক উপত্যকা বলা হয়। যার উত্তরে ডিমাহাসাও জেলা ও মেঘালয় রাজ্য, পূর্বে মণিপুর ও মিজোরাম রাজ্য, দক্ষিণে ত্রিপুরা রাজ্য ও পশ্চিমে রয়েছে বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্র। উত্তর-পূর্ব ভারতের এই ভূখণ্ড সমগ্র ভারতের তুলনায় এখনও অনেক পিছিয়ে পড়া অঞ্চল। কিন্তু তার গল্পগুলোতে আঞ্চলিকতার ছোঁয়া থাকলেও একজন নিপুণ কথাশিল্পীর দক্ষতায় তাঁর লেখা আঞ্চলিকতার গণ্ডী ছাড়িয়ে সভ্যতা ও মানবিকতার পরিসরে বিস্তৃত। বরাক উপত্যকা ভারতীয় সংঘের অভিন্ন অঙ্গ, সিলেট গণভোটের ফলে ভারতের প্রাপ্ত সাড়ে তিন থানা ও পূর্বতন কাছাড় জেলার সন্মিলিত ভূখণ্ড। ভৌগলিক ভাবে ভারতীয় উপমহাদেশের গাঙ্গেয়-ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার পূর্বপ্রান্তীয় সমতলভূমি। সমগ্র ভারতের সঙ্গে বরাক উপত্যকা সিন্ধু-গাঙ্গেয় সভ্যতার উত্তরাধিকার বহন করে, বরাকের সমাজ ভারতের সমাজের অংশ। দীপাংশু দাশের গল্পগুলোর সমাজ বরাকের সমাজ হয়েও ভারতীয় সমাজের প্রতিভূ। যেহেতু তিনি একজন সমাজ সচেতন লেখক, তাঁর গল্পে ভারতীয় সমাজবাস্তবতা প্রখররূপে প্রকাশিত। এই প্রবন্ধের লক্ষ্য থাকবে আলোচ্য গ্রন্থের গল্পগুলো থেকে উদ্ধৃত ভারতীয় সমাজের বাস্তবতা ও সমস্যার উপর একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা।

লক্ষ্য:

এই গল্পগ্রন্থে ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন সমস্যা ও বাস্তবতা নির্ভর নিদর্শনমূলক গল্প বিধৃত হয়েছে। লেখকের দৃষ্টিকোণে রচিত গল্পগুলো থেকে ভারতীয় সমাজ বাস্তবতা বিষয়ক একটি প্রতিবেদন রচনা এই প্রবন্ধের লক্ষ্য। লেখকের উল্লেখিত সামাজিক সমস্যাগুলো সামাজিক-মানবিক জীবনযাপনে কেমনতর প্রতিক্রিয়া রাখছে গল্পগুলোর প্রেক্ষিতে তার অনুসন্ধান হবে। এই গ্রন্থের একুশটি গল্পে লেখকের উল্লেখিত বাস্তবতাগুলোকে তিনটি পর্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে, এই তিনটি পর্যায় বিষয়ে আলোচনা হবে প্রবন্ধে, সেই তিনটি পর্যায় নিম্নরূপ-

(ক) অন্ধবিশ্বাস- কু-প্রথা এবং নারী জীবন কেন্দ্রিক বাস্তবতা
(খ) দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগের ফলে উদ্ভূত সামাজিক-নাগরিক বাস্তবতা
(গ) আধুনিক যুগ প্রসূত আর্থ-সামাজিক-পারিবারিক বাস্তবতা

পাঠ বিশ্লেষণ:

অন্ধবিশ্বাস-কু-প্রথা এবং নারী জীবন কেন্দ্রিক বাস্তবতা:

এই সংকলনে অন্ধবিশ্বাস-কু-সংস্কার ও সামাজিক কু-প্রথা বিষয়ক তিনটি গল্প রয়েছে, সেগুলো হল- ডাইন, যৌতুক ও বটগাছের সাক্ষী। 'ডাইন' গল্পের মুখ্য বিষয় হল- গ্রামীণ মানুষের ডাইন সন্দেহে একজনকে গণপিটুনিতে হত্যা। 'যৌতুক' গল্পের মুখ্য বিষয় হল- যৌতুক চাওয়া এবং যৌতুক না পেলে পাশবিক নির্যাতন। 'বটগাছের সাক্ষী' গল্পের মুখ্য বিষয় হল- মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসকে রটনা দিয়ে উচ্ছ্বসিত করে আর্থিক উপার্জনের চেষ্টা। লক্ষণীয় যে 'ডাইন' ও 'বটগাছের সাক্ষী' গল্প দু'টি অন্ধবিশ্বাস ও কু-সংস্কার বিষয়ক রচনা এবং 'যৌতুক' একটি সামাজিক কু-প্রথাকে প্রদর্শিত করে। গল্পত্রয়ীর সমাজ-বাস্তবতা খুবই প্রখর, একুশ শতকে পৌঁছেও বিজ্ঞানভিত্তিক চেতনা ও কু-প্রথানির্মূল চেতনা যে সমাজের তৃণমূল স্তরে সঞ্চারিত হতে পারেনি তার উদাহরণ উপস্থাপন করে।

'ডাইন' গল্পটিতে যে বিষয়টি উপস্থাপিত হয়েছে তেমন ঘটনা ভারতের প্রান্তীয় বা গ্রামীণ সমাজে মাঝে মধ্যে ঘটেই থাকে। 'ডাইন হত্যা' সারা বিশ্বে হয়ে থাকে, এই অন্ধবিশ্বাস ভারতেও সক্রিয়। রিপোর্ট অনুসারে

বিগত বিশ বছরে ভারতে তিন হাজারের বেশি ডাইনি সন্দেহে হত্যা করা হয়। বাস্তবে হয়তো এই সংখ্যা আরও বড়। ভারতে সাংবিধানিক ভাবে ডাইনি হত্যা নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। বিভিন্ন রাজ্যে প্রতিরোধে অনেক আইন ও প্রাশাসনিক ব্যবস্থা আছে তবুও পূর্ণ নিবারণ সম্ভব হচ্ছে না। ডাইনি হত্যা মূলত অন্ধবিশ্বাসে কোন মহিলাকে কালা জাদুকারী বা অলুক্ষণে ভেবে হত্যা করা হয়। হত্যা করতে গণপিটুনি, গৃহদাহ ইত্যাদি করা হয়ে থাকে। ডাইনি হত্যায় মূলত বৃদ্ধা মহিলাকে চিহ্নিত করা হয় কিন্তু এই গল্পে ব্যতিক্রম পুরুষকে ডাইনি অপবাদে হত্যা করা হয়।[১] যদিও গল্পটির উপস্থাপন আঞ্চলিক সাহিত্যের শৈলীতে, তা শুধু শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নে অনুন্নত গ্রামের প্রেক্ষাপট রচনা করে। তবুও গল্পটি নিছক বরাকের গল্প না হয়ে সম্পূর্ণ ভারতীয় সভ্যতার গল্প হয়ে যায়, কারণ ডাইন প্রথা ভারতের সকল প্রান্তেই ঘটে থাকে। একুশ শতকের আধুনিক যুগে পৌঁছেও গ্রামের সমাজে অম্লানভাবে অন্ধবিশ্বাস ও কু-সংস্কার প্রচলিত আছে, তারই নিদর্শনমূলক গল্প 'ডাইন'।

কেন লোক এখনও অন্ধবিশ্বাস আঁকড়ে আছে তার একটি প্রেক্ষাপট বা ধারণা তৈরি করে গল্পটি তার ক্ষুদ্র পরিসরে। এই গল্পে বরাকের যে গ্রামটি উল্লেখ করা হয়েছে সে'টি একটি প্রান্তীয় গ্রাম। গ্রামটির নাম কদমটিল্লা, গ্রামটি শহর শিলচর থেকে চল্লিশ-পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। চা-বাগান ও ঘন জঙ্গলের পাশে অবস্থিত এই ছোট বাঙালি অধ্যুষিত গ্রাম। গ্রামের দক্ষিণে জঙ্গলে পার্বত্য জনজাতির গ্রাম, উত্তরে চা-বাগানের আদিবাসীদের গ্রাম। গ্রামটিতে 'বিদ্যুৎ পৌঁছলেও বিশুদ্ধ পানীয় জল নেই।' অর্থাৎ গ্রামটি এখনও অবকাঠামোগত উন্নয়নে পিছে পড়ে আছে। হাসপাতাল গ্রাম থেকে দূরে। এই গ্রামে নদীর জল বা কুয়োর জল গ্রামের মানুষের পানের জন্য ভরসা। কার্তিক মাস এলে গ্রামের মানুষের মধ্যে ডায়েরিয়ার আতঙ্ক দেখা দেয়। সাপে কাটলে গ্রামের লোক প্রথমে হাসপাতালে না নিয়ে গ্রামের সাপের ওঝাকে দিয়ে ঝাড়ফুঁক করায়। এমনতর প্রাচীনপন্থী তথা অনুন্নত গ্রামে মানুষেরা কবিরাজিতে ও ঝাড়ফুঁকে বিশ্বাস করে থাকে। এগুলো অন্ধবিশ্বাস ও কু-সংস্কার। গল্পকার গল্পে উল্লেখ করছেন যে এমনতর গ্রামে অশিক্ষিত বাবা-মায়েরা বুঝে উঠতে পারে না যথাযথ তাদের করণীয় কী। এই যথাযথ করণীয় কী না বুঝে প্রথমে গ্রামীণ কবিরাজির উপর ভরসা করেন। সাপে কাটলেও হাসপাতালে না নিয়ে প্রথমে ঝাড়ফুঁক করান। এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র ৫৫ বছরের পৌঢ় প্রকাশ দাস কবিরাজি পেশাতে নিযুক্ত, তবুও তিনি বিজ্ঞানে ভরসা রাখেন, অবস্থা বেগতিক দেখলে হাসপাতালে পাঠানোর বন্দোবস্ত করে দেন। 'কবিরাজি' হল পরম্পরাগত চিকিৎসা। এ গল্পে প্রকাশ দাসের কবিরাজি হল তিনি খাবার কিছু ওষুধ দিয়ে থাকেন এবং মন্ত্র পড়া জল বা তেল দিয়ে থাকেন। অর্থাৎ তিনি পরম্পরাগত ওষুধের পাশাপাশি ঝাড়ফুঁক করে থাকেন।

কীভাবে একটি মিথ্যে রটনা তৈরি হয় তার নিদর্শন উপস্থাপন করেছেন গল্পটিতে। প্রকাশ দাস একজন নিঃসন্তান। তিনি শিশুদের ভালোবাসেন, শিশুরাও তাকে ভালোবেসে তার কাছে আসে। লালরেম নামে এক উপজাতির ছেলেকে দেখতে তাকে ডেকেছিল। তিনি পৌঁছে দেখেন ছেলেটি জ্বরে কাহিল, তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় এই ছেলেকে সুস্থ করে তোলা সম্ভব নয় বলে তিনি লালরেম'কে ধমক দিয়ে বলেছেন ছেলেকে যত শীঘ্রই সম্ভব হাসপাতালে নিয়ে যেতে। তিনি তার এক শিশি ওষুধ খেতে দিয়ে বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু ঘর থেকে বেরিয়ে কিছু দূর আসতেই লালারেম'এর স্ত্রীর গলাফাটা কান্না শুনতে পান, তিনি দুর্ভাবনা করছেন যে তার ধারণা সত্যি হয়ে গেল না তো? তিনি সাগরের ছোট ছেলে সুলনকে নাতি জ্ঞানে আদর করেন। সুলন তার ঘরে খেলতে আসে। একদিন তার ঘরে খেলতে গিয়েছিল, তার পরেরদিন ছেলেটির খুব ডায়রিয়া হয়। তিনি গিয়ে ডায়রিয়ার কারণ অনুসন্ধান করে দেখেন সাগরের ঘরের উনুনের পাশে মুড়ি ভাজার কালো বালু পড়ে আছে। তিনি অনুধাবন করতে পেরেছেন ছেলেটি খুশিতে মায়ের ভাজা মুড়ি বেশি খেয়ে ফেলেছিল বলে এমন হয়েছে, তিনি সুলনকে শীঘ্রই হাসপাতালে নিয়ে যেতে পরামর্শ দেন। তারপরে একদিন সাগরের বৌ ঝুমা পুকুরের ঘাটে

কাপড় কাচতে যখন তার সঙ্গে ছিলেন আরও মহিলা, তখন তিনি একটি কথা পাড়লেন যে তার মনে হয় প্রকাশ একজন ডাইন, প্রকাশের ঘর থেকে আসার পর থেকেই সুলন অসুস্থ হয়। 'ডাইন' নামে একপ্রকার অন্ধবিশ্বাস প্রচলিত আছে গোঁড়া ও প্রান্তীয় সমাজে। ডাইন বলতে একধরনের ভয়ানক অপশক্তিকে মনে করা হয়, কোন ব্যক্তি তান্ত্রিক শক্তিতে মানুষের অকল্যাণ ঘটিয়ে থাকে। ঝুমার কথায় আরেকজন মহিলা যোগ দিয়ে বলেন যে সে কথাটি ঠিক বলেছে, তিনি হয়তো কোন জাদুশক্তিতে এই শিশুদের বশ করে রেখেছেন তাই হয়তো শিশুরা তার ঘরে যায়। ঝুমার উত্থাপিত বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠিত করতে আরেক মহিলা কথাটিতে আরেকটি বিষয় যোগ করে, একদিন সে একটি বস্তু নিতে প্রকাশের ঘরে গিয়ে দেখে প্রকাশ ঠাকুর ঘরে পুজো দিচ্ছে, তিনঘন্টা পর বস্তুটি ফিরিয়ে দিতে গিয়েও দেখে প্রকাশ ঠাকুর ঘরে, চোখগুলো জবাফুলের মতো লাল। তার সন্দেহ যে পুরুষ মানুষ এত সময় কেন ঠাকুর ঘরে থাকবে, নিশ্চয় জাদুটোনা করছে। এই কথাটি পুকুরের ঘাটে থেকে তিন মুখে ছড়িয়ে পড়ে, ধীরে ধীরে পুরুষদের মধ্যেও সন্দেহটি ছড়িয়ে যায়। এর মধ্যে, চা বাগানের শ্রমিক মুন্না রবিদাসের ছেলে বিকেল সাড়ে তিনটায় ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়, বাবা মা কাজ থেকে সন্ধ্যের সময় ফিরে বাবা মা পাতলা ঝোল নিরামিষ পথ্য করে খাওয়ায় কিন্তু অবস্থা বেগতিক দেখে পাশের বাঙালি পাড়া থেকে প্রকাশ দাসকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসে। ছেলেটিকে মুন্না কোলে তুলে তখন ছেলেটি কষ্ট করে চোখ খুলে বাবাকে বলে যে তার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। যখনি প্রকাশ চিকিৎসার জন্য তার হাত ধরছেন ছেলেটি তখনি চেতনা হারাল। তিনি অবস্থা বেগতিক দেখে ১০৮ নম্বরে ফোন করে অ্যাম্বুলেস ডেকে তাদেরকে ছেলেটিকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে পরামর্শ দেন। ছেলেটি মারা যায়। এমনিতেই প্রকাশের নামে গ্রামে ডাইন অপপ্রচার রয়েছে, তা'তে এই শিশুমৃত্যু যেন আগুনে ঘি পড়ল। গ্রামের লোকেরা তার ঘরে ভিড় করতে শুরু করল, তিনি গ্রামের সবাইকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন কিন্তু গ্রামের মানুষ বুঝতেই চাইছে না, তাদের সন্দেহ তিনি ডাইন । লোকে বলছে যে তিনি জাদুটোনা জানেন নইলে তিনি জল পড়া তেল পড়া দিলে কি এমনিতে লোক সুস্থ হয়ে যায়। শিশু হত্যা নিয়ে গ্রামের লোক উত্তেজিত হচ্ছিল, তখন ভিড়ের মধ্য থেকে লালরেম বলে উঠল যে তার ছেলেকেও প্রকাশ মেরে ফেলেছে। ভিড় জনতার উত্তেজনা বেড়ে গেল। উত্তেজিত জনতা প্রকাশকে গণপিটুনি দিয়ে হত্যা করে ও তার ঘর পুড়িয়ে দেয়। অন্ধবিশ্বাস ও কু-সংস্কার সমাজের ভয়ানক অযৌক্তিক ও অমানবিক পরিস্থিতি তৈরি করে তার একটি উদাহরণ রচনা করেছেন লেখক এই গল্পে।

'বটগাছের সাক্ষী' একটি মিথ্যা রটনার গল্প। কোন স্পর্শকাতর বা উত্তেজনাকর সামাজিক বিষয় ভুলে বা ভ্রান্তিতে এক মুখ থেকে কয়েক কান হয়ে গেলে তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে লোক সমাজে, তা অজস্র উচ্চারণে তিল থেকে তালে পরিণত হয়। মিথ্যা রটনাকে লোকসমাজ অন্ধবিশ্বাসে বা আবেগে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়। এই গল্পে গ্রামের মধ্যবর্তী একটি বটগাছকে গ্রামের লোকেরা 'ভৈরবের গাছ' হিসেবে শ্রদ্ধা করত। একবছর প্রবল তুফানে গাছটি উপড়ে মাটিতে পড়ে যায়, কিছু লোক জ্বালানির জন্য গাছের ডাল-কাণ্ড কেটে নিয়ে যায় বাকি থাকে গুঁড়ির অংশ। পরের বছর বর্ষাকালে গাছটিতে পাতা গজে উঠে এবং যেকোন কারণে একরাতে গাছটি তার পূর্বের স্থানে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। শ্রদ্ধার গাছটি নিজের স্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে জানার পর গ্রামের লোকেরা পুজো দিতে আসে, আশপাশের গ্রামের লোকেরাও পুজো দিতে আসত। একদিন এই বটগাছ তলার পুজোর পুরোহিত সনাতন ভট্টাচার্য বাল্যবন্ধু সুধন্য দেবের ঘরে চা খেতে বসে জানায় মন্দিরের দক্ষিণা সতেরো লাখ টাকা জমে গেছে, সেই টাকা দিয়ে সে বটগাছতলাকে পাকা করে বাঁধিয়ে দিতে চায়। কিছুদিন পর কথক সুধন্য দেব জানতে পারেন যে কেউ নাকি স্বপ্নে পেয়েছেন পুত্রসন্তানবতীরা ভিক্ষা সংগ্রহ করে ভৈরবের পুজো দিতে হবে, তাই গ্রামের মহিলারা দলে দলে ভিক্ষা সংগ্রহ করে পুজো দিতে শুরু করলেন। এর পরে একদিন সুধন্য দেব বাল্যবন্ধু সনাতনকে পেয়ে জানতে চান, মহিলাদের এই যে দলবেঁধে ভিক্ষা সংগ্রহ করে ভৈরবের

পূজা দিচ্ছেন বিষয়টি কি? তখন সনাতন জানায় যে বটতলায় ভক্ত সংখ্যা কমে আসায় তার মন ব্যথিত হয়, তিনি ও তার স্ত্রী মিলে পুজো দেন ও কথাটি গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। ভারতীয় সমাজে ভিক্ষা সংগ্রহ করে পুজো দেওয়ার একটি সংস্কৃতি রয়েছে কিন্তু এই গল্পে এটা ঘটেছে একটা গুজবে। ভারতীয় গ্রামীণ মানুষেরা সহজ ভক্তিতে ও ভয়ে অন্ধবিশ্বাসী- এটা ভারতীয় সমাজের বাস্তবতা, তাই এদের আবেগে স্পর্শ করে সহজেই বিমোহিত বা পরিচালিত করা যায়। সচেতন কথাশিল্পীর দৃষ্টিতে এই সমাজ বাস্তবতা প্রতিফলিত হল এই গল্পে।

'যৌতুক' গল্পের মুখ্য বিষয় পণপ্রথা। পণপ্রথা হল একটি সামাজিক কু-প্রথা। বিয়েতে কন্যাপক্ষ থেকে দাবি করে যে অর্থ বা সম্পত্তি আদায় করা হয় তাকে পণ বলে। পণ একটি সামাজিক অন্যায় তথা অত্যাচার। ভারতীয় সমাজে যৌতুক প্রথার বাস্তবতা বিষয়ে 'Dowry system as a Social Evil: A Study of India' প্রবন্ধ থেকে একটি উদ্ধৃতি উল্লেখযোগ্য-

> "Brides are compelled by their in-laws to bring large sums of money, gold, technological equipment, and other opulent gifts from their families in the form of Dowry (Dalmia & Lawrence, 2005). This financial pillage does not end with the wedding ceremony, but continues there after. However, the wedding ceremony was not just about this repressive institution. It is such a benefit because it shields us from immorality. Our society is getting increasingly vulnerable to it on a daily basis. This is why the majority of marriages either do not take place on time or end in divorce. Apart from that, the greedy nature of humans is the primary cause for the dowry system. Dowry deaths, which refer to a bride's suicide or murder perpetrated by her husband or in-laws, are concerning (Kodoth, 2008; Nazzari, 1991). After a year of harassment and physical torment, a bride is sometimes drenched in kerosene and set on fire. This affects not just the bride but also her parents and family. Her parents must face all of the responsibilities for their daughter's well-being in her in-laws' house. A bride's morale suffers, and she sees herself as a burden on her parents in every way."[২]

যৌতুক গল্পে, কিরণশঙ্কর মেয়ে রিনাকে একটি গৃহস্থ পরিবার দেখে বিয়ে দেন। পাত্রপক্ষের বেশ ক্ষেতের জমি ও বড় সুপারি বাগান আছে। বাগানের আয় দিয়েই পরিবার চলে। মেয়েকে বিয়েতে গয়নায় সাজিয়ে বিয়ে দিয়েছেন। বিয়ের পর রিনা স্বামীকে বাইক কেনার জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা এনে দেয়। তার মাস দুয়েক পর বিজয় আরও বিশ হাজার টাকার দাবি করে, এই টাকা দিয়ে সে একটি ব্যবসা শুরু করতে চায়। রিনা টাকা চাইতে মানা করে, তখন বিজয় তাকে যুক্তি দেখায়-

> "বিজয় কঠিন সুরে বললো বোঝার চেষ্টা কর। অযথা তর্ক কর না। তোমাকে বিয়ে করেছি বলেই না ব্যবসা করতে হচ্ছে। কারণ তোমার চাহিদা মেটাতে হচ্ছে। তাই ব্যবসার টাকা তোমার বাবাকেই দিতে হবে।"[৩]

এই অপব্যাখ্যার কাছে বাধ্য হয়ে সে বাবার কাছ থেকে বিশ হাজার টাকা এনে দেয়। এই টাকা দিয়ে সে বাড়ির সামনের সড়কের পাশে একটা ভূষিমাল দোকান দেয়। বারবার এই অন্যায় আবদার মেনে তাকে দাম্পত্য রক্ষা করতে হয়। বিজয়ের এইসব অত্যাচার মেনে চলার পিছনে রিনার ধারণা-

> "..... সমাজ জীবনে এখনও একটি বিয়ে লোহার শিকলে আবদ্ধ একটি বন্দি জীবনের মত। বললেই সংসার ভাঙা যায় না। আইনের প্যাঁচ আছে, সমাজের ভয় আছে। যতই কষ্ট হোক,

> স্বামী যতই অসহ্য বকুক, তা স্বামীর পরিবার যতই পদে পদে লাঞ্ছিত করুক মুখ বুজে সংসার ধর্ম পালন করতে হয়।"[৪]

শুধু তথাকথিত 'সংসার ধর্ম' পালন করতে ও দাম্পত্য রক্ষার তাগিদেই এই অত্যাচার মেনে চলেছে রিনার মতো গৃহবধূরা। অপরদিকে অত্যাচারী বেরোজগারী স্বামী বিজয়ের ধারণা-

> "..... তোমাকে চিনতে পেরেছি, স্বামীর দুঃখ তুমি বুঝ না। তাই তোমার সঙ্গে কাজের কথা ছাড়া অত্যধিক কথা বলার মানে নেই। ক্রেতার সঙ্গে বিক্রেতার সম্পর্ক শুধু বেচা-কেনার মধ্যেই, এর বাইরে যা কথা হয় তা শুধু প্রসঙ্গান্তরে। আন্তরিকতার ছোঁয়া নেই বিন্দুমাত্র।"[৫]

তার এই ভাবনার মধ্যে দু'টি বিষয় লক্ষণীয়, প্রথমত সে চায় তার স্ত্রী তার অভাব বুঝে, বাবার ঘর থেকে টাকা পয়সা এনে তাকে সাহায্য করুক। দ্বিতীয়ত, সে তাদের দাম্পত্যকে ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্ক মনে করে, সে যেন দাম্পত্য বিক্রি করছে। এই দু'টি ভাবনাই পণ প্রথার ভিত্তি।

তার কিছুদিন পরেই তাকে আরও বিশ হাজার টাকার জন্য চাপ দিতে শুরু হয় পরিবার থেকে, এই দাবিতে শাশুড়ি ননদী সবাই মিলে চাপ দেয়। দোকানে আরও বস্তু তুলতে সে এই টাকা দাবি করে। রিনা বারবার টাকা আনতে পারবে না বললে তার উপর শারীরিক অত্যাচার করা হয়, তখন সে সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা, তবুও তাকে শারীরিক নির্যাতন করা হয়। পরেরদিন সেই দুর্বল শরীর নিয়ে বাবারবাড়ি গেলে রিনার বড় ভাইয়েরা তাকে নিয়ে আইনের দ্বারস্থ হয়। তারপর থেকে বিজয় পলাতক ছিল। বিজয়ের বাবা প্রতাপ রিনার বাবা কিরণশঙ্করের কাছে সমঝোতা চেয়ে অভিযোগ তুলে নিতে প্রার্থনা করেন। মেয়ের সংসারের দিকে চেয়ে ছেলেদের আপত্তি সত্ত্বেও কিরণশঙ্কর অভিযোগ তুলে নেন ও সঙ্গে বিশ হাজার টাকা দিয়ে শ্বশুরবাড়ি পাঠান। তারপর রিনার একটি কন্যাসন্তান হয়, তার ব্রতে কিরণশঙ্কর নাতনিকে সোনার চেইন ও মামারা পায়ের নুপুর দিল। তা'তে বিজয়ের পরিবারদের মন ভরেনি। তাদের আশা ছিল রিনার বাবার বাড়ি থেকে নাতনিকে ফিক্সড ডিপোজিট দেওয়া হবে। তাই রিনাকে চাপ দেওয়া হয় টাকা চাইতে। রিনা তখন মানা করে বলে যে তাদের মেয়ের জন্য তার বাবা থেকে কেন টাকা চাইবে। তখন বিজয় জানায় যে-

> "মেয়ে জন্ম দিয়েছিস, আবার তর্ক করছিস। এখন এ মেয়ে বিয়ে দিতে অনেক যৌতুক লাগবে। সে কোথা থেকে আসবে। আমি কিন্তু পরিষ্কার বলে দিচ্ছি, তোর বাবার কাছে এক লাখ টাকা ফিক্সড ডিপোজিট আদায় করতে হবে তোকে। নাহলে মা-মেয়ে দুটোকে তাড়াব।"[৬]

যারা যৌতুক নেয় তারা যৌতুক দেয়, তারা মেয়ে বিয়ের এই প্রথা ধরে রেখেছে। তাই মেয়ে জন্ম তাদের কাছে বোঝা। মেয়ে সন্তানটিকে ভবিষ্যতে বিয়ে দিতে যে পণ লাগবে সেটাও তারা বৌয়ের বাবা থেকে চায়। "Banned by the law, practiced by the society: The study of factors associated with dowry payments among adolescent girls in Uttar Pradesh and Bihar, India" প্রবন্ধ থেকে পণপ্রথার বাস্তবতার এই দিকটি বিষয়ে একটি উদ্ধৃতি প্রণিধানযোগ্য-

> "He further stated that inability to give dowry causes victimization of brides; whereas, the glorification of dowry generates son preference leading to female feticide, sex-ratio imbalances, and gender inequality [20]. Prevailing son preference in Indian societies leads to female feticide so as to avoid the burden of dowry [21–23]. "[৭]

অর্থাৎ এই যে মেয়ে বিয়েতে যৌতুক দিতে হবে এই ভয়ে তারা মেয়ে সন্তান চায় না, কন্যা ভ্রূণ হত্যার এটা একটা বড় কারণ। পাত্রীর বাবা শুধু মেয়ের পণের বোঝা নয় মেয়ের মেয়ের পণের বোঝাও বইতে হয়। নিশ্চয় কোন মেয়ে এই অত্যাচার মুখ বুজে মেনে নেবে না, রিনাও মানেনি। তাই বিজয় রিনাকে লাথি মারল, রিনার

অপারেশনের জায়গা দিতে রক্ত আসা শুরু হলো। রাতে কাতর হয়ে বিজয়কে রক্তক্ষরণের কথা বললে সে পাত্তা না দিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে রইল, সকালে অবস্থা বেগতিক দেখে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো।

অহরহ পণ দাবি থেকে ডমেস্টিক ভায়োলেন্স বা গার্হস্থ্য নির্যাতনের শুরু হয়, তার উদাহরণ 'যৌতুক' গল্পে। গৃহবধূদের উপর গার্হস্থ্য নির্যাতন ঘটেই থাকে, তার উদাহরণ প্রস্তুত করেছেন 'ভালোবাসার অপমৃত্যু' গল্পে। দীর্ঘ সতেরো বছর প্রেমের পর শুভেন্দু ও সুনয়নার বিয়ে হয়। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে আসার পর শ্বশুরবাড়ির পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করে, কিন্তু শ্বশুর শাশুড়ির মন জয় করে উঠতে পারেনি, তাদের অভিযোগের অভাব নেই। গৃহবধূ সুনয়নাকে একা হাতে পুরো পরিবারের ফাই-ফরমাশ কাটতে হয়, পান থেকে চুন খসলেই অভিযোগের তালিকা বৃদ্ধি পায়, তাকে সহ তার বাবা-মা'কে সম্বোধন করে গালাগাল দেওয়া হয়। ঘরে ফিরে শুভেন্দু বাবা মায়ের কোন অভিযোগ শুনলেই সুনয়নাকে বাক্যবাণে জর্জরিত করে। দিনে দিনে সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠে। সুনয়নার শাশুড়ি আচারসর্বস্ব নারী, একদিন সন্ধ্যাবাতি দিতে সুনয়নার দেরি হয়ে গেলে তিনি তাকে কথা শোনান। শুভেন্দু এসে সুনয়নাকে কথা শোনাতে গিয়ে কথা বড় হয়ে যায়, সে সুনয়নার সাথে দাম্পত্যে সুখী নয়, সুনয়নাকে ডিভোর্স দেবার চিন্তা করছে ইত্যাদি বিষয় বললে সুনয়না মনোদুঃখে আত্মহত্যা করে। 'ভালোবাসার অপমৃত্যু'তে গৃহবধূর উপর মানসিক নির্যাতন ও 'যৌতুক' গল্পে গৃহবধূর উপর শারীরিক নির্যাতনের উদাহরণ পেলাম।

ভারতীয় সভ্যতার ও সমাজের একটি অন্যতম লক্ষণ যৌথ পরিবার। কিন্তু অধুনা যুগে ক্ষুদ্র পরিবার ও একক পরিবারের প্রবণতা অধিক। পরিবারের বন্ধন ধরে রাখার ত্যাগ স্বীকার ও তাগিদ–দু'টোই হারিয়ে যাচ্ছে। ছোট ছোট ব্যাপারে পরিবার ভেঙে যাচ্ছে। পূর্ববর্তী প্রজন্ম বা গৃহের অভিভাবকরা যৌথ পরিবারের আশা করেন, পরিবার ভেঙে যাওয়া তাদের জন্য দুঃখজনক। এই গ্রন্থের 'ব্যবধান' গল্পে একটি পরিবার পৃথকীকরণের গল্প বর্ণিত হয়েছে। স্বামী হারা নারী সরলা রোজগার করে দু'টি খুদে সন্তানকে পালন করে বড় করেন। তার বয়স পৌঢ়ত্বে পৌঁছে গেলে তিনি ঘরের কামকাজ সামলিয়ে উঠতে পারছেন না তাই রোজগেরে বড় ছেলেকে বিয়ে দেন। বিয়ের আগে তিনি পরিবারের একতার কামনায় একটি বাংলা পদ্য ছাপিয়ে ফ্রেমে বাঁধিয়ে ঘরের দেওয়ালে টাঙান। পদ্যটি ছিল, "ভাই বড় ধন/রক্তের বাঁধন/ ভাই পৃথক হয়/নারীর কারণ।" কিন্তু তার আশা পূর্ণ হয়নি। সরলাও আচার সর্বস্ব নারী, আচার পালনে ত্রুটি নিয়ে তার পুত্রবধূর উপর অভিযোগ হয়। 'ভালোবাসার অপমৃত্যু'তেও দেখেছি শাশুড়ি আচারসর্বস্ব নারী, হিন্দু পরিবারে শাশুড়ি ও গৃহবধূ বিবাদের একটি সাধারণ কারণ থাকে আচার পালনে ত্রুটি। লেখক খুবই নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণে রচনা করেছেন, তিনি উভয়পক্ষের মানসিকতা ও যুক্তি সহযোগে গল্পের কায়া-কল্প করেছেন। সরলা দেবী গৃহকর্ম করতে পারছেন না বলেই ছেলেকে বিয়ে দিয়েছেন। শাশুড়ি গৃহকর্মে সাহায্য না করার অভিযোগে ছেলে মিঠন বৌ অনিকে নিয়ে পরিবার পৃথক হয়ে যায়।

ভারতে বিবাহের পর বধূকে শ্বশুরবাড়ি চলে যেতে হয়, শ্বশুরবাড়িকেই আপন করে নিতে হয়। যে দম্পতির পুত্রসন্তান নেই তারা কন্যা বিবাহের পর নিরুপায় হয়ে পড়েন। এই বিষয়ে আলোকপাত করে 'ছেলে' গল্পটি রচনা। পুত্রসন্তানহীন সত্যেন্দ্র ও সুলেখা দু'টি কন্যা বিবাহের পর ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে অসহায় বোধ করেন। নিজের গার্হস্থ্য নিয়ে ব্যস্ত মেয়েরা এসে বৃদ্ধ অবস্থায় বা অসুস্থ অবস্থায় পাশে দাঁড়াবে না। এই ভেবে তারা একটি পুত্র সন্তানের প্রয়োজন বোধ করেন। তারা একটি পাঁচ বছরের ছেলে দত্তক নেন। ভারতে যে পুত্রসন্তান প্রাপ্তির প্রবণতা ও তাগিদ তার পিছনে একটি উল্লেখযোগ্য কারণ কন্যার বিবাহ পরবর্তী শ্বশুরবাড়ি গমন।

দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগের ফলে উদ্ভূত সামাজিক-নাগরিক বাস্তবতা:

আলোচ্য গল্প সংকলনের নাম 'উদ্বাস্তু', উদ্বাস্তু অর্থাৎ যে বাস্তুভিটে ছাড়া হয় বা যে বাস্তুহীন। ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি থেকে স্বাধীনতাকালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগ সংঘটিত হয়, জন্ম হয় দু'টি স্বাধীনরাষ্ট্রের, যথা ভারত ও পাকিস্তান। দ্বিজাতিতত্ত্ব ছিল ধর্মের ভিত্তিতে। এই দ্বিজাতিতত্ত্বের নামে সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা ছিল তুঙ্গে, নতুন ধর্মীয় রাষ্ট্র গঠনে পাকিস্তান অংশে সংখ্যালঘুদের উপর সাম্প্রদায়িক হিংস্র আক্রমণ ঘটে। প্রাণ ও নারীসম্ভ্রম রক্ষার্থে সেই অংশের সংখ্যালঘুরা উদ্বাস্তু হয়ে ভারত খণ্ডে প্রব্রজিত হয়। ভারত খণ্ডে এসে শরণার্থী জীবন থেকে সামাজিক জীবনে উত্তরণে অনেক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আসতে হয়েছে। এই ঐতিহাসিক তথা সামাজিক বিষয়ে বাংলা সাহিত্যে উল্লেখনীয় রচনা থাকলেও এ বিষয়ে লেখক মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এই গল্পসংকলনে শরণার্থীদের জীবনযাপন বা জীবনসংগ্রাম নিয়ে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য রচনা নেই। যদিও কিছু গল্পে গত প্রজন্ম বা প্রথম জীবনে শরণার্থী জীবনের উল্লেখ থাকলেও তা উদ্বাস্তু জীবনসংগ্রাম বিষয়ক গল্প নয়, তা গল্পে দু'টি আখ্যান তৈরি করে। প্রথমত, উত্তর-পূর্ব ভারতের বাঙালি সমাজের সিংহভাগ শরণার্থী পরিবার। দ্বিতীয়ত, শরণার্থী পরিবারের প্রথম প্রজন্ম বা যে শরণার্থী ছিলেন তার প্রথম জীবনে, শরণার্থী অবস্থা থেকে সামাজিক জীবনে ও আর্থিক স্বচ্ছলতা অর্জনে কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অতএব, উদ্বাস্তু বিষয় শুধু গল্পের চরিত্র ও প্রেক্ষাপট নির্মাণে ভূমিকা রেখেছে, গল্পের মুখ্য প্রেক্ষাপট হয়ে ওঠেনি। এই ধরনের গল্পগুলো হলো- আত্মবর্গ, বটগাছের সাক্ষী, সমাধান নেই ও দর্শন ভঙ্গ ইত্যাদি।

'সমাধান নেই' ও 'দর্শন ভঙ্গ' গল্প দু'টি প্রতিফলিত করছে যে দু'টি শরণার্থী পরিবার আর্থিকভাবে ও শিক্ষাদীক্ষায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে দেশ ও মানবতার উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। 'সমাধান নেই' গল্পে অনিমেষ পালের পরিবার দেশভাগকালীন সময়েই ভারতে চলে আসে, তারা তিনভাই সুপরিকল্পিতভাবে রোজগার করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। বড় ভাই সুব্রতর হোটেল রেস্টুরেন্টের ব্যবসা, অনিমেষের ঠিকাদারি ব্যবসা। তিন ভাইয়ের ঘরে এক পুত্র সন্তান অনিমেষের ছেলে অভিষেক। সে ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা করে ব্যক্তিগত গবেষণায় নিয়োজিত, সে গাড়ি দুর্ঘটনারোধে যন্ত্র বানাতে দিনরাত এক করছে। এতদিন অনিমেষ বিজ্ঞান সাধক ছেলেকে ব্যবসা ধরতে চাপ দেননি। বয়স হয়েছে শরীর দিয়ে পেরে উঠছেন না বলে ঠিকেদারি ব্যবসা গুটিয়ে নিতে চান অনিমেষ। কিছুদিনের মধ্যেই তার শ্রমিকেরা তার ঘর ভিড় করে আবেদন করে যেন তিনি কাজ বন্ধ না করেন। এখানে তাদের কর্মসংস্থান হয়, কাজ বন্ধ হলে তাদের নতুন কর্মসংস্থান পাওয়া কঠিন হবে এবং পরিবার চালনা কষ্টকর হবে। তখন শ্রমিকদের মুখ দেখে অভিষেকের নববিবাহিত স্ত্রী তাকে বোঝায় যে তার বিজ্ঞান সাধনা মানব সেবার স্বার্থে তেমনি ব্যবসা পরিচালনা করে কর্মসংস্থান করাও মানবসেবা। তখন সে ব্যবসার হাল ধরতে রাজি হয়। 'দর্শন ভঙ্গ' গল্পে ফণীভূষণ ও সুনীল দুই বন্ধু এক গ্রামের প্রতিবেশী একসাথে উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে আসে, দু'জনার ছেলে মেয়ে পড়াশোনা করে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছে, ফণীভূষণের ছেলে ডাক্তারি পড়াশোনা করে বিদেশে প্র্যাকটিস করতে গেছে ও সুনীলের ছেলে ডাক্তারি পাশ করে বিদেশে না গিয়ে দেশেই প্র্যাকটিস করছে।

এতসব সুখ-ছবির পাশাপাশি দেশভাগের বলিদের একটি সংগ্রামময় জীবনযাপন গাথা রয়েছে তা সচেতন লেখকের সংজ্ঞানে রয়েছে। সরাসরি জীবন সংগ্রাম বিষয়ক গল্প রচনা না করলেও তার উদ্বাস্তু বীক্ষা উল্লেখনীয়। বিশেষ করে উত্তর-পূর্ব ভারতে শরণার্থী সমাজ স্থানীয় জনজাতিদের দ্বারা অনেক সাম্প্রদায়িক আক্রমণ ও সামাজিক হেনস্থার শিকার হয় এবং নাগরিকত্ব যাচাইয়ের নামে হয়রানি হয়েই থাকে। যা সুস্থ সামাজিক-নাগরিক জীবনযাপনের অনুকূল পরিস্থিতি নয়। তার উদ্বাস্তু'দের সমস্যা ও সমাধান ধারণা ব্যক্ত করেছেন 'উদ্বাস্তু'

গল্পে। আলোচ্য গল্পে তিনি নৈর্বক্তিক ভাবে একটি সত্য উপস্থাপন করেছেন যে দেশভাগের বলি সংখ্যালঘুরা শুধু দেশভাগের কালেই উদ্বাস্তু হননি। ঐস্লামিক পাকিস্তান কিংবা অধুনা বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা সুরক্ষিত নয়, কালে কালে তাদের উপর হিংস্র সাম্প্রদায়িক আক্রমণ ঘটেই থাকে। তাই প্রাণ রক্ষার্থে মাতৃভূমির মায়া ছেড়ে চৌদ্দপুরুষের ভিটে ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে প্রব্রজিত হতে হয়। এই প্রব্রজন ক্রমাগত হয়ে চলেছে। এই গল্পের পটভূমিকা একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকে বরিশাল শহর। বরিশালের সতীশ বণিক একজন স্বর্ণকার, দোকানের পিছনে ঘর। তার পাড়া সাম্প্রদায়িক আক্রমণে মন্দির লুঠ হয়, তার দোকান লুঠ হয়, সেই উন্মত্ত জনতা থেকে প্রাণ রক্ষার্থে রাতের অন্ধকারে পালান। একটি ট্রাকে উঠে ভেবেছিলেন সিলেটে পিসির বাড়ি আশ্রয় নেবেন। কিন্তু স্ত্রী মালতীর ইচ্ছায় সপরিবারে ভারত প্রব্রজনে বাধ্য হন। ধর্মীয় পরিচয়ের জন্য নির্যাতিত লাঞ্ছিত হয়ে ভয়ে ভয়ে শঙ্কিত হয়ে জীবন যাপন করার থেকে মুক্তি পেতে ও স্বাধীন ধর্মীয় জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে ভারতে আশ্রয় নিলেন। তারা ভারতের আসাম রাজ্যের করিমগঞ্জে এসে পৌঁছেছিলেন। মালতীর আবেগ আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখনীয়-

> "মার খেয়ে মরার চেয়ে ধরা পড়ে জেলে গিয়ে ইন্ডিয়া গিয়ে মরা অনেক ভাল। ইন্ডিয়া সরকারের কাছে আর্জি জানাবো আমরা ভিটেহারা খেদা খাওয়া মানুষ। একটু আশ্রয় দিন। আর কিছু চাই না। বেঁচে থাকার অধিকার দিন। আমার ভোট লাগে না, নাগরিকত্ব লাগে না, একটু বাঁচতে দিন।"[৮]

শুধু বাঁচার আর্জি নিয়েই ওপারের সংখ্যালঘুরা ভারতে আশ্রিত হন। সেই দ্বিতীয় দশকে ভারত উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান করতে রাজনৈতিক ভাবে উত্তাল এবং সঙ্গে রয়েছে আন্দোলন-প্রতিবাদ। আসামে তখন সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে রাষ্ট্রীয় নাগরিকপঞ্জী নবীকরণের দীর্ঘসূত্রী প্রক্রিয়া চলছে। এতে শরণার্থীদের উত্তরসূরী ও স্থানীয় নাগরিকদের নাগরিকত্ব প্রমাণে নাজেহাল অবস্থা। তার মধ্যে কেন্দ্রীয় NDA সরকার দেশভাগের শিকার উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দিতে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন আনতে বদ্ধপরিকর, তার বিরোধিতায় আসাম সহ বেশকিছু রাজ্যে CAA বিরোধী আন্দোলন সংঘটিত হয়। সেই উত্তাল সময়ে প্রব্রজিত সতীশ বণিক একটি সংবাদপত্রের প্রতিবেদন বা সম্পাদকীয় পড়ে মনে বল পায়, সেই উদ্ধৃতিটি প্রণিধানযোগ্য-

> "অসমে উদ্বাস্তুরা দেশভাগের বলি, সরকার তাই আন্তরিক, তাদের নাগরিকত্ব দেওয়া উচিত। ভারতে হিন্দুরা নাগরিকত্ব না পেলে আর কোথায় পাবে? ..... তাই বাংলাদেশ থেকে আগত হিন্দুদের নাগরিকত্ব দেওয়া উচিত মানবিকতার খাতিরে। রাষ্ট্রসংঘের আইনও তাই বলছে।"[৯]

দেশভাগের শিকার হয়ে যাদের কালে কালে প্রব্রজিত হয়ে ভারতে এসেছিল তাদের নাগরিক-সাংবিধানিক-সামাজিক সুরক্ষা দিতে নাগরিকত্ব প্রদান একটি অন্যতম উপায়। এই উদ্ধৃতিটিতে যেন সমগ্র শরণার্থী বর্গের আর্তি-প্রার্থনা প্রকাশিত হলো।

'আত্মবর্গ' গল্পটিতে দেশভাগ কীভাবে পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনদের বিচ্ছিন্ন করেছে তারই নিদর্শন। মহেন্দ্র পাল ও স্বপন পাল পিসতুতো-মামাতো ভাই, সমবয়সী, সহপাঠী। দু'জনেই সিলেটে কলেজে পড়াকালীন দেশভাগের সময় প্রাণের ভয়ে ভারতে আশ্রয় নেয়। ভারতে এসে স্বপন পাল চাকরি করতে ত্রিপুরায় চলে যান, মহেন্দ্র থেকে যান বরাকে। তাদের সংগ্রামমুখর জীবনে যোগাযোগ ছিল না। মহেন্দ্রের ছেলে রিতম চাকরি পেয়ে দিল্লীনিবাসী, তার ইউনিভার্সিটি জীবনের বান্ধবী রিয়ার সাথে দীর্ঘদিনের প্রেমের পর বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে গেলে পরিচয় দিতেই রিয়ার বাবা স্বপন তাদের পূর্ব ইতিহাস বলেছেন। তখন রিতম-রিয়ার জ্ঞান হয় যে তারা ভাই-বোন, হিন্দু সম্প্রদায়ে ভাই-বোনের মধ্যে বিয়ের কথা ভাবাও পাপ, তারা এই ভাবনা থেকে সরে এসে আফশোসে ভরে উঠে। দেশভাগের মতো প্রলয়ঙ্কারী ঘটনা পরিবার আত্মীয়-স্বজনদের বিচ্ছিন্ন করে, দ্বিতীয় পর্বে

উদ্বাস্তু জীবনে কঠিন জীবনসংগ্রামে ঠিকে থাকতে অর্থের রোজগারে দিগ্বিদিকে ছুটতে হয়েছে আরও বিচ্ছিন্ন হতে হয়েছে। দেশভাগ ও উদ্বাস্তু জীবন চিরপরিচিতদের করেছে অচেনা, দেশভাগ যেসব সামাজিক ক্ষতি করেছে তার একটি বিষয় তিনি এই গল্পে উপস্থাপন করেছেন।

আধুনিক যুগ প্রসূত আর্থ-সামাজিক-পারিবারিক সমস্যা:

আধুনিক যুগে বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও সামাজিক নীতির উন্নতি জীবনযাপনে ও সমাজের চরিত্রে বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়েছে। আধুনিক যুগের অন্যতম লক্ষণ প্রতিবন্ধকতা নির্মূলীকরণ ও সহজগম্যতা তৈরি। এই যুগে শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা গ্রহণের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ হয়েছে। কর্মক্ষেত্র শুধু প্রদেশে বা দেশে আটকে নেই তা পুরো বিশ্বে বিস্তৃত হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি ঘটেছে। আলাপ-যোগাযোগের উন্নতি ঘটেছে, এখন বিশ্ব যোগাযোগ হাতের মুঠোয় মুঠাফোনে, অনলাইন আলাপ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এমনতর কল্যাণকর বিষয়ের পাশাপাশি তাদের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া রয়েছে, তার ফলে কিছু আর্থ-সামাজিক-পারিবারিক কিংবা ব্যক্তিগত সমস্যা তৈরি হয়েছে। লেখক তেমনি কিছু সমস্যার উপর আলোকপাত করে কিছু গল্প তৈরি করেছেন।

বর্তমান যুগের একটি চর্চিত বিষয় 'ব্রেইন-ড্রেইন', সেই বিষয়ের উপর তিনি বেশ কয়েকটি গল্প লিখেছেন, সেই গল্পগুলো হল- প্রতিদান, অর্ণব, দর্শন ভঙ্গ, ভালোবাসা অতঃপর বিয়ে ইত্যাদি।

অক্সফোর্ড ডিকশনারি মতে ব্রেইন-ড্রেইন হল- "the movement of highly skilled and qualified people to a country where they can work in better conditions and earn more money" অথবা অনলাইন ডিকশনারি মতে- "when large numbers of educated and very skilled people leave their own country to live and work in another one where pay and conditions are better." অর্থাৎ একটি আর্থিক অনুন্নত দেশের শিক্ষিত ও দক্ষ লোকের অধিক উপার্জন লোভে ও উচ্চমানের প্রতিষ্ঠানে কর্মক্ষেত্রে সুযোগের লক্ষ্যে একটি অর্থনৈতিক উন্নত দেশে প্রব্রজন ঘটায়, তাকে ব্রেইন-ড্রেইন বলে। একে 'মানব সম্পদের প্রব্রজন' বলা যায়। এই সম্পদের প্রব্রজন দেশের উপর একটি অর্থনৈতিক ক্ষতি, প্রাথমিক ভাবে সেই মানব সম্পদ গড়তে অনুন্নত দেশটির আর্থিক ও শৈক্ষিক পরিকাঠামো মূলধনের বিনিয়োগে, কিন্তু সেই মানব সম্পদ সেই দেশের উন্নতিতে অবদান না রাখলে সে'টি সেই দেশের আর্থিক ও মানব সম্পদের ক্ষতি। ব্রেইন-ড্রেইন'এর বাস্তবতা বিষয়ে পূজা কুমরা তার Problem of Brain Drain in Developing Countris Like India And It's Socio-Economic Impacts প্রবন্ধে বলেছেন,

> "India is a developing country and it is becoming a major supplier of human capital for the advanced economies. Brain drain may have meager positive impact on our economy in the short run but being a developing country, India cannot afford exodus of highly valued professionals and there is need to review our long-term higher education strategy in this regard."[১০]

অর্থাৎ তিনি এই প্রবন্ধে 'ব্রেইন-ড্রেইন'কে ভারতের জন্য একটি আর্থ-সামাজিক সমস্যারূপে চিহ্নিত করেছেন। গল্পকার দীপাংশু দাশ তার গল্পগুলোতে Brain Drain এর ফলে উদ্ভূত আর্থ-সামাজিক সমস্যার পাশাপাশি পারিবারিক ও ব্যক্তিগত সমস্যার উপর আলোকপাত করেছেন।

আমরা আগে লক্ষ্য করেছি তার এই গ্রন্থের সবগুলো গল্পের প্রক্ষাপট একুশ শতকের বরাক উপত্যকা। বরাক উপত্যকা ভারতের একটি অনুন্নত অঞ্চলের মধ্য পড়ে, অতএব যদি এই স্থান নামকে প্রতীক হিসেবে নেই তবে তা ভারতের অনুন্নত অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করে, তা ভারতের উন্নয়নশীল দেশের স্বরূপ প্রদর্শিত করে। বরাক উপত্যকার বৈশিষ্ট্যগুলো এমন, এখানে কিছু সরকারি উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেমন একটি

কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, একটি মেডিকেল কলেজ, একটি কারিগরি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে সেই উচ্চশিক্ষিতদের কর্মসংস্থানের সংকুলান যোগ্য বন্দোবস্ত নেই। কিন্তু এতদ অঞ্চলের উন্নতিতে ব্যাপক মানবসম্পদের প্রয়োজন রয়েছে। সেই অবস্থায় ব্রেইন ড্রেইন একদিকে মানবসম্পদদের কর্মসংস্থান দিচ্ছে, তার বদলে তার মাতৃভূমি পাচ্ছে বৈদেশিক মুদ্রা রেমিটেন্স। বৈদেশিক মুদ্রা আমদানি একটি অর্থনীতির জন্য প্রয়োজনীয়। অপরদিকে তার দেশ হারাচ্ছে একটি মেধা, একটি মানবসম্পদ। এই টানাপোড়েন অবস্থার উপর আলোকপাত করেছেন 'দর্শন ভঙ্গ' গল্পে। ফণীভূষণ ও সুনীল দুই বাল্য বন্ধুর ছেলে একসঙ্গে ডাক্তারি পাশ করে। ফণীভুষণের ছেলে আমেরিকা যেতে ইচ্ছে করলে তিনি তাতে বাধা দেননি কিন্তু সুনীল তার ছেলেকে বিদেশ যেতে দেননি, দেশে থেকেই দেশসেবা করার পরামর্শ দিয়েছেন। সুনীলের যুক্তি আলোচনা প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য-

> "তবে ছেলেকে আমি বলে দিয়েছি, বিদেশে গিয়ে লাভ নেই। দেশেই কাজ কর। বিদেশ থেকে চেয়েচিন্তে আনা প্রযুক্তি কৌশলের জন্য হয়ত দেশ অনেক আধুনিকতার রূপ দেখেছে। উন্নত হয়নি। এখনও দেশকে গড়তে হবে। তাই তোদের মত ছেলেদের দেশের এখন ভীষণ দরকার। দেশকে গড়তে অনেক কাজ বাকি। দেশের মানুষকে তো আগে পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যবান কর। দেশের মানুষ স্বাস্থ্যবান হলেই দেশের উন্নতির কথা বেশি করে চিন্তা করতে পারবে।....."[১১]

লেখক শুধু সমস্যার নমুনা প্রদর্শন করছেন না, তিনি সমস্যা সমাধানের আদর্শ বা নীতি চরিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরছেন। সুনীল এমন একজন বাবা যে ছেলের আর্থিক ভাবে উন্নত জীবনের লোভ বলিদান দিয়ে দেশের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষায় ছেলেকে দেশসেবার পরামর্শ দিচ্ছেন। ভারতে চিকিৎসকের চাহিদা ও চিকিৎসক ব্রেইন ড্রেইন বিষয়ে Raavesh S. এর 'Brain Drain: Socio-Economic Impact on Indian Society' গবেষণা পত্র থেকে একটি মন্তব্য আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য-

> "The effects on India, especially in rural areas where the density of doctors is lower than in urban areas. Despite increasing internal demand, India still has a very low density of doctors (0.6 per thousand people in 2004) compared with 3 in the US and 2 in Canada. Compared with other large origin countries, India records higher expatriation rate of doctors: 8%; while the expatriation rate of, say, Chinese doctors is about 1%. This does not prevent, of course, India from having a large and powerful modern health sector; as in other countries, the migration of health professionals may coexist with a dynamic urban sector and the inequitable social distribution of medical resources at the country level."[১২]

এমতাবস্থায় চিকিৎসকদের ভারত ছেড়ে বিদেশে যাওয়া ভারতীয় সমাজের জন্য ক্ষতিকর। বাস্তব-সচেতন লেখক উপরোক্ত গল্পগুলোতে শুধু চিকিৎসক প্রব্রজনের উদাহরণ করেছেন, শুধু 'প্রতিদান' গল্পে ইঞ্জিনিয়ারের প্রব্রজনের বিষয় আছে।

এই গল্পগ্রন্থে লেখকের উদ্দেশ্য 'ব্রেইন-ড্রেইন' এর ফলে উদ্ভূত পারিবারিক-সামাজিক সমস্যাকেও উপস্থাপন করা। 'দর্শন ভঙ্গ' গল্পে সুনীল তার ছেলে নাতিকে নিয়ে আনন্দে সুখে দিন কাটায়। অপরদিকে ফণীভূষণের ছেলে পরিবার সহ থাকে আমেরিকায়, বৃদ্ধ পিতা-মাতা থাকেন ভারতে। দেশেও যদি সন্তানেরা এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে যায় এই পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। বাংলা ছোটগল্পের অন্যতম লক্ষণ ব্যঞ্জনাময় অন্ত, যা পাঠশেষে পাঠককে চমকিত করে ব্যঞ্জনায়িত হয়ে এক অতৃপ্তির রেশ তৈরি করে। লেখক সেই শিল্পীশৈলীর

যথার্থ প্রয়োগে সেই diaspora সমাজের আরেকটি স্বরূপ ব্যঞ্জনায়িত করলেন। তা হল, ফণীভূষণ নাতির সাথে অনলাইন চ্যাটে পূজোয় দেখতে আসার কথা বললে খুদে নাতি উত্তরে যা বলল, আলোচনা প্রসঙ্গে তা প্রণিধানযোগ্য-

> "সরি ঠাকুর্দা, আমার স্কুল তো বন্ধ হবে না। স্কুল বন্ধ না হলে কি করে আসি? তাহলে স্কুলের পড়ায় পিছিয়ে যাব। পাপা বলেছেন, বেশি করে না পড়লে পাপার মতো ডাক্তার হতে পারব না। ঠিক নয় কি?"[১৩]

প্রত্যেক প্রদেশে নিজস্ব জাতীয় উৎসব থাকে যেমন বাঙালি সমাজে দুর্গাপূজা সেই জাতীয় উৎসবে সপরিবারে মিলিত হন এবং উৎসবের সময় স্কুলে-অফিসে ছুটি দেওয়া হয়, এসময় দেশে বিদেশে ছড়িয়ে থাকা পরিবারের সদস্যরা এসে মিলিত হন। কিন্তু আর্থিক, পেশাগত বা অন্যান্য কারণে বিদেশে থাকা Diaspora যখন চান তখনি দেশে ফিরতে পারেন না, দীর্ঘকাল পর পিতা-মাতার সঙ্গে মিলতে আসেন ও প্রতি বৎসর উৎসবেও একত্রে মিলিত হতে পারেন না। এটা একধরনের সাংস্কৃতিক ও পারিবারিক বিচ্ছিন্নতার পরিস্থিতি তৈরি করে। 'উদ্বাস্তু' শব্দের সমার্থক শব্দ শরণার্থী (Refugee), ছিন্নমূল (uprooted) ইত্যাদি। 'ব্রেইন ড্রেইন'এর এই ডায়স্পরা'রা কি ছিন্নমূল হয়ে যাচ্ছেন না তো নিজেদের সংস্কৃতি ও পরিবার থেকে, দ্বিতীয়ত, ডায়স্পরা'রা সেই দেশে বাসের সুযোগ পেয়েছে মেধার যোগ্যতায় তাই তার পরবর্তী প্রজন্মকে সেখানে টিকতে হলে মেধা অর্জন করতে হবে। তাই মেধা হিসেবে তৈরি হতে মেধাযন্ত্র হয়ে যাচ্ছেন না তো? ছিন্নমূল হয়ে যাচ্ছেন না তো স্বাভাবিক মানব জীবন থেকে? এখানেই গ্রন্থ নাম 'উদ্বাস্তু' নামটি ব্যঞ্জনায়িত হয়ে সার্থক হয়ে যায়। নাতির এই উত্তরে ফণীভূষণ একেবারেই অবাক নন, কারণ এই ধরনের শিক্ষা তো তারই তৈরি করা। এটাই ফণীভূষণের অভিভাবক সত্ত্বার ট্র্যাজেডি, ব্রেইন-ড্রেইনের শিকার অভিভাবকদের ট্র্যাজেডি।

'ঝোপ বুঝে কোপ' গল্পটি অধুনা কালের শিক্ষাক্ষেত্রের বাস্তবতার একটি দিককে প্রকাশিত করে। বর্তমান সময়ের শিক্ষা ব্যবস্থার বেহাল অবস্থা, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও ইংরেজি মাধ্যমে পড়ানোর প্রতি ঝোঁক, শিক্ষক নিয়োগে ভাষাভিত্তিক ত্রুটিকে উপস্থাপন করে। প্রথমত, অধুনা কালে ভারতে কর্মসংস্থানের অভাব, উচ্চশিক্ষিতরা যোগ্য কর্মসংস্থান পাচ্ছেন না, এমতাবস্থায় যে কোন সরকারি চাকরিতে নিয়োগ এলে আবেদন করছেন। কিন্তু প্রতিটি সার্ভিস সেক্টর তার নির্দিষ্ট আগ্রহী কেন্ডিডেট ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদেরই চায়। এখানেই অনাগ্রহী বা অযোগ্য প্রার্থীও সেই চাকরিতে চলে আসতে পারে, সেখানেই তৈরি হতে পারে একটি ত্রুটি বা সমস্যা। শিক্ষাক্ষেত্র চায় শিক্ষাকর্মে আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থী। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র সনয় ইংরেজি মাধ্যমের ছাত্র, সে ইংরেজি সাহিত্য ও তুলনামূলক সাহিত্যে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছে। বাংলা ভাষা তার রপ্ত নয়, যতটুকু বাংলা জানে তাতে ছাত্র পড়ানো যাবে না। তুলনামূলক সাহিত্যের ছাত্র হিসেবে সে জানে কোন ভাষায় দক্ষ না হলে সে ভাষায় প্রাথমিক বা বিদ্যায়তনিক যথার্থ পাঠদান হবে না। রাজ্য সরকার TET পরীক্ষার আয়োজন করেছে, রাজ্য সরকারের অধিকাংশ বিদ্যালয় আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যম। তাই সে TET আবেদনে অনাগ্রহী। কিন্তু সনয়ের মা উচ্চশিক্ষিত বেকার ছেলেকে TET পরীক্ষায় আবেদন করানোর জন্য চাপ সৃষ্টি করেন। অগত্যা মায়ের তাগিদে সনয়কে আবেদন করতে হয়। মেধাবী সনয় TET পাশ করার পর তার নিয়োগ হয় বরাকের কদমটিল্লা নামক এক প্রান্তীয় গ্রামের লোয়ার প্রাইমারি স্কুলে। স্কুলটি বাংলা মাধ্যম স্কুল। সে ভয়ে ছিল একটি বাংলা মাধ্যম স্কুলে সে পড়াতে পারবে কি না। শিক্ষায় ভাষা মাধ্যম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভারতের মতো বৈচিত্র্যময় দেশে আঞ্চলিক ভাষা না জানা শিক্ষকেরা যথার্থ পাঠদান করে উঠতে পারবে না। সরকারের অনুদানে চলা বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আঞ্চলিক ভাষায়। ভারতে একটি বড় অংশ মেধা ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল গুলো থেকে আসছে, তাদের অনেকেই আঞ্চলিক ভাষায় দক্ষ নয়। সনয় তাদের প্রতিনিধি। এমন লোক আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে শিক্ষক

হয়ে এলে তার পাঠদান মাধ্যম-যোগ্য হবে না। দ্বিতীয়ত, বেসরকারি ও ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়ানোর প্রবণতার পিছনে কারণ হিসেবে অভিভাবকেরা মনে করেন সরকারি স্কুলে পড়াশোনায় শিক্ষকেরা ফাঁকি দেন। সরকারি স্কুলের পাঠদান যথাযথ নয়। এমনই মত প্রকাশ করেছেন গল্পে সনয়ের মা মণিকা। এই বাস্তববোধ থাকলেও তিনি একজন সুবিধাবাদী ব্যক্তি। এই ত্রুটির সুযোগে তিনি তার আঞ্চলিক ভাষা না জানা ছেলেকেও মানানসই দেখাতে চান। শিক্ষাক্ষেত্রে বেহাল দশার জন্য অনেক কারণ রয়েছে। তাতে কর্মসংস্থানের জন্য যেকোন সত্যকে আড়াল করলে সেই বেহাল দশাতেই অবদান রাখা হয়। যেখানে স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিজের ছেলে-মেয়েদের বেসরকারি ও ইংরেজি মাধ্যমে পড়ান, তাতে কি সরকারি শিক্ষা ক্ষেত্রের বেহাল দশাকেই প্রমাণিত করে না? এই প্রধানশিক্ষকের সঙ্গে মণিকা নিজের সুবিধায় তোলা যুক্তি বা প্রশ্ন শিক্ষা ব্যবস্থার বাস্তবতাকে দর্শায়।

প্রতিমা বিসর্জনের শোভাযাত্রায় অধুনা যুগে ধর্ম বা উৎসবের নামে হৈ হুল্লোড় বিষয়ের উপর আলোকপাত করে 'বিসর্জন' গল্পটি। ভারত একটি হিন্দু ধর্মাবলম্বীয় অধ্যুষিত অঞ্চল। অধুনা কালে অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় যে উৎসবের নামে মদ খেয়ে মাতলামি করে, অ-ধর্মীয় গানে নেচে হৈ হুল্লোড় হয়ে থাকে। এটা একটা অপসংস্কৃতি। তার কারণে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে, ধর্মের পবিত্রতা ও সৌন্দর্যতার পরিপন্থী এসব। হিন্দু সম্প্রদায়ে পুজোর পর প্রতিমা বিসর্জনে শোভাযাত্রা হয়ে থাকে। তা একটি সুন্দর সংস্কৃতি। কিন্তু এখানেও অপসংস্কৃতির প্রবেশ ঘটেছে। যুবক যুবতীরা মদ খেয়ে, DJ বক্স জোর শব্দে বাজিয়ে রাস্তাজুড়ে নেচে হৈ হুল্লোড় করে যাওয়া হয়। রাস্তা হল দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সামাজিক ক্ষেত্র। রাস্তা মানুষের প্রয়োজনীয় স্থান ও জরুরী কালীন সেবার স্থানের যোগাযোগ প্রদান করে। সেই রাস্তা জুড়ে রাস্তা বন্ধ করে হৈ হুল্লোড় অসামাজিক ও অমানবিক। এমনি একটি ঘটনা নিয়ে 'বিসর্জন' গল্পটি রচিত। গল্পে একটি পাড়ার পুজোর পর প্রতিমা বিসর্জনে শোভাযাত্রা হচ্ছে, মদে মাতাল ছেলেরা রাস্তা জুড়ে নাচছে, পিছেনের রাস্তা জ্যাম হয়ে রয়েছে সেদিকে তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই। একজন সাইকেল আরোহী শোভাযাত্রার পাশ কেটে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন তখন একজন মদ্যপ তার উপর পড়ে যায় এবং এতে বিবাদ তৈরি হয়। এমন হৈ হুল্লোড়ে শৃঙ্খলা ও সুরক্ষা বজায় থাকে না, ভিড়ের হৈ হুল্লোড়ে সুরক্ষার অমনোযোগীতার সুযোগে প্রতিশোধস্পৃহায় একটি হত্যাও হয়ে যায় গল্পটিতে।

উপসংহার:

দীপাংশু দাশের বাস্তবতা-বোধ সম্পন্ন গল্পগুলো রচনার একটি বৈশিষ্ট্য হল তিনি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে উভয়পক্ষের যুক্তি ও মানসিকতা বিধৃতির প্রয়াস করেন। যদি কোন সমস্যার উল্লেখ করেন তবে সমস্যা সৃষ্টিকারীর যুক্তি মানসিকতা ও পরিস্থিতির সন্ধান করেন গল্পে। অর্থাৎ তিনি খুঁজতে চান ভারতের সমাজের সমস্যাগুলোর পটভূমিকার কারণ। তার লেখা গল্পগুলো তুলনামূলক। তিনি শুধু সমস্যা বর্ণনা করেন না, দায়িত্ববান সামাজিক ও লেখকের মতো সম্ভাবনাময় সমাধানের সূত্র উল্লেখের চেষ্টা করেন। তার কিছু গল্পের চরিত্ররা অত্যন্ত আদর্শবান, যারা সদর্থক ভাবে সামাজিক সমস্যা বিমোচনের প্রয়াসী, তার জন্যে ত্যাগ স্বীকারেও প্রস্তুত। কিন্তু তিনি লক্ষ্য করেছেন এমন আদর্শবানদের সমাজে বোকা ভাবা হয়, কারণ সমাজের স্রোতের বিপরীতে তারা আদর্শ ও নীতিকে প্রাধান্য দেন। তার গল্পগুলোতে তিনি অধুনা যুগের দেশপ্রেমের নতুন যুগোচিত ভাবনার প্রকাশ করেছেন, যেমন দেশের মেধা বিদেশে অত্যধিক আয়ের আশা ছেড়ে দেশে থেকে দেশকে উন্নত করার জন্য দেশসেবাই এযুগের দেশপ্রেম। বাংলা ছোটগল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ তত্ত্ব ও উপদেশের অনুপস্থিতি, কিন্তু লেখক সমাধান সূত্রে কিছু তত্ত্ব ও উপদেশ অবলীলায় বলে যান, রচনাগুণে তা গল্পে বোঝা হয় না তা গল্পে প্রেক্ষাপট ও চরিত্র নির্মাণে ভূমিকা রাখে। তার গল্পগুলো পাঠে পরিলক্ষিত হয়, ভারতের সমাজের সমস্যাগুলোর জন্য যেসব বিষয় দায়ী, প্রথমত: শিক্ষা ও বিজ্ঞানমনস্কতা সমাজের তৃণমূল স্তরে না পৌঁছানো , এবং দ্বিতীয়ত: অধুনা সমাজে নীতি ও আদর্শের অভাব।

তিনি গল্পগুলোতে দেশভাগের ফলে শরণার্থী হয়ে আশ্রয় নেওয়া উদ্বাস্তুদের দেশের অর্থনীতির জন্য বোঝা না ভেবে, উপস্থাপন করেছেন আগতরাও মানুষ ও সম্ভাবনাময় মানবসম্পদ। ভারতে প্রব্রজনের দীর্ঘকালের জীবন সংগ্রামে ও যাপনে সেই শরণার্থী পরিবারেরা ও তাদের পরবর্তী প্রজন্ম শিক্ষায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে, বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়ে, দেশসেবায় সমান অংশগ্রহণ করে চলেছে।

এই গল্পসংকলনে কিছু গল্পে পারিবারিক সমস্যা ও পরিবার বিচ্ছিন্নতার কিছু কারণ নিদর্শন করেছেন গল্পকার। তিনি সমাজ বাস্তবতার দেশীয় স্তরের সমস্যা থেকে তৃণমূল স্তরের সমস্যায়, সমাজ থেকে পরিবারের সমস্যায় বিচরণ করেছেন। এই সংকলনে একুশ শতকের প্রথম দু'দশকের ভারতীয় আর্থ-সামাজিক কিছু সমাজ বাস্তবতা তার গল্পে তুলে এনেছেন নিদর্শনমূলক ভাবে।

তথ্যসূত্র:

(১) Alam, Samsher and Raj, Dr. Aditya. Witchcraft and Witch Hunting in India An Assessment.
(২) Malik, A. H. & Malik, A. M. (2022). Dowry System as a Social Evil: A Study of India. American Journal of Multidisciplinary Research in Africa, 2(1): Page- 2.
(৩) দাশ, দীপাংশু। যৌতুক, উদ্বাস্তু। নতুন দিগন্ত প্রকাশনী, শিলচর, ২০২১ খ্রিঃ, পৃ. ৪১।
(৪) তদেব, পৃ. ৪৩।
(৫) তদেব, পৃ. ৪৩।
(৬) তদেব, পৃ. ৪৭।
(৭) Banned by the law, practiced by the society: The study of factors associated with dowry payments among adolescent girls in Uttar Pradesh and Bihar, India; Introduction.
(৮) দাশ, দীপাংশু। উদ্বাস্তু, উদ্বাস্তু। নতুন দিগন্ত প্রকাশনী, শিলচর, ২০২১ খ্রিঃ, পৃ. ৬০।
(৯) তদেব, পৃ. ৬১-৬২।
(১০) Kumra, Pooja. PROBLEM OF BRAIN DRAIN IN DEVELOPING COUNTRIES LIKE INDIA AND ITS SOCIO-ECONOMIC IMPACTS, abstract.
(১১) দাশ, দীপাংশু। দর্শন ভঙ্গ, উদ্বাস্তু। নতুন দিগন্ত প্রকাশনী, শিলচর, ২০২১ খ্রিঃ, পৃ. ১৭২।
(১২) S. Raavesh, Brain Drain: Socio-Economic Impact on Indian Society. International Journal of Humanities and Social Science Invention; page- 16.
(১৩) দাশ, দীপাংশু। দর্শন ভঙ্গ, উদ্বাস্তু। নতুন দিগন্ত প্রকাশনী, শিলচর, ২০২১ খ্রিঃ, পৃ. ১৭৩-১৭৪।

গ্রন্থপঞ্জি:

আকর গ্রন্থ:

(১) দাশ, দীপাংশু। উদ্বাস্তু। নতুন দিগন্ত প্রকাশনী, শিলচর, ২০২১ খ্রিঃ।

সহায়ক গ্রন্থ, জার্নাল ও প্রবন্ধ:

(১) রায়, সব্যসাচী। অভিবাসন, নাগরিকতা ও আসাম, প্রাক উপনিবেশ কাল থেকে নাগরিকপঞ্জি নবায়ন। শিলচর, বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন, ২০২২ খ্রিঃ।
(২) বর্মন, প্রসূন (সম্পা)। দেশভাগ-দেশত্যাগ প্রসঙ্গ উত্তরপূর্ব ভারত। কলকাতা; গাঙচিল; ২০২৩ খ্রিঃ ।
(৩) শিকড়ের খোঁজে- প্রেক্ষিত বরাক-সুরমা। সম্পাদনা বিমলাংশু রায় ফাউন্ডেশন, শিলচর; ২০২১ খ্রিঃ।
(৪) Bhattacharjee, Swarupa. Student Movement in the Barak Valley: 1973-1994. Agartala, Akshar Publication, 2022 AD
(৫) Alam, Samsher and Raj, Dr. Aditya. Witchcraft and Witch Hunting in India An Assessment. Researchgate; 2018 AD. Access link-

https://www.researchgate.net/publication/323416012_Witchcraft_and_Witch_Hunting_in_India_An_Assessment/link/5a9525d00f7e9ba429712738/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19 ; Access Date- 14/07/2024, Access Time- 06:05 PM.

(৬) Biswas, Anil Kumar. Witch-Hunt in the 21 ST Century: A Serious Challenge to the Empowerment of Rural Tribal Women in India. Researchgate; 2018 AD. Access link- https://www.researchgate.net/publication/344932860_WITCH-HUNTS_IN_THE_21_ST_CENTURY_A_SERIOUS_CHALLENGE_TO_THE_EMPOWERMENT_OF_RURAL_TRIBAL_WOMEN_IN_INDIA/link/5f99949b299bf1b53e4bdb39/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19; Access Date- 14/07/2024, Access Time- 06:30 PM.

(৭) Malik, A. H. & Malik, A. M. Dowry System as a Social Evil: A Study of India. American Journal of Multidisciplinary Research in Africa, 2(1): 1-9.; Researchgate; 2022 AD. Access link- https://www.researchgate.net/publication/358646801_Dowry_System_as_a_Social_Evil_A_Study_of_India/link/620d5d234be28e145c99f53e/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19; Access Date- 15/07/2024, Access time- 6:10 PM

(৮) Banned by the law, practiced by the society: The study of factors associated with dowry payments among adolescent girls in Uttar Pradesh and Bihar, India; National Library of Medicine; 2021 AD. Access link- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8519446/; Access Date- 15/07/2024, Access time- 6:30 PM

(৯) Kumra, Pooja. PROBLEM OF BRAIN DRAIN IN DEVELOPING COUNTRIES LIKE INDIA AND ITS SOCIO-ECONOMIC IMPACTS; International Journal of Humanities and Social Science Invention, 2013 AD. Access Link- https://www.ijhssi.org/papers/v2(5)/version-3/C251217.pdf; Access Date- 13/7/24, Time: 3:12 PM.

(১০) S. Raavesh. Brain Drain: Socio-Economic Impact on Indian Society; International Journal of Humanities and Social Science Invention; International Journal of Humanities and Social Science Invention; 2013 AD. Access link- https://www.academia.edu/8850992/PROBLEM_OF_BRAIN_DRAIN_IN_DEVELOPING_COUNTRIES_LIKE_INDIA_AND_ITS_SOCIO_ECONOMIC_IMPACTS; Access Date- 13/7/24, Time: 3:20 PM.

Abbreviation:

NRC- National Register of Citizenship
CAA- Citizen Amendment Act
NDA- National Democratic Alliance
TET- Teacher Eligibility Test